আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

সবুজপত্র

সৈয়দ আলী আহসান
জাতীয় অধ্যাপক
৬০/১ উত্তর ধানমন্ডী, ঢাকা
ফোন : বাসা ৯১১৬৬৮৯

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ইতিহাসকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় অষ্টম শতক থেকে। এর পূর্বের ইতিহাস আছে, কিন্তু তা সুস্পষ্ট নয়। তখন সুস্পষ্টভাবে এবং বিশেষ ধারাক্রম অনুসারে এ অঞ্চলের কর্মকাণ্ড প্রবাহিত হয়নি। সুতরাং সে সময়কার কথা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রয়োজন হয় না। অষ্টম শতক থেকে পাল রাজত্বের আরম্ভ। তারা এ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় রাজ্য শাসন করতেন। তাদের আমলে সুস্পষ্ট এবং শৃঙ্খলিত কোন নগর-জীবন গড়ে ওঠেনি। এর ফলে সে সময়কার সংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। নৃত্য, গীত এবং লোকরঞ্জনের বহুবিধ উপকরণ সকল মানুষের আচরণবিধি এবং জীবন যাপনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। পালরা যেহেতু বৌদ্ধ ছিল, সুতরাং তারা মানুষে মানুষে বিভাজন মানত না। তখন এমন অবস্থা ছিল যে, কর্মের দায়ভাগে এবং অধিকারে একজন শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারত, আবার ব্রাহ্মণও ইচ্ছা করলে শূদ্র হতে পারত। শূদ্র হওয়াটা তখন ঘৃণার বা অপরাধের ছিল না। বাংলা ভাষার প্রথম কবি সরহপা ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন, বড় হয়ে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হন এবং নালন্দা বিদ্যাপীঠের একজন আচার্যের সম্মান লাভ করেন। তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে একজন অন্ত্যজ শ্রেণীর রমণীকে গ্রহণ করে নিু পর্যায়ের মানুষের মধ্যে বসবাস করতে থাকেন। এভাবে তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন যে, মানুষের পরিচয় হচ্ছে তার বুদ্ধিতে, বিবেকে, অনুভূতিতে এবং মননে, তার পরিচয় জাতিগত বিচারে নয়।

দ্বাদশ শতকে কর্ণাটক থেকে বহিরাগত সেনরা এসে যখন এদেশকে অধিকার করল, তখন তারা একটি নিষ্ঠুর শোষণ-কার্যের মধ্য দিয়ে এদেশবাসীকে নির্যাতন করতে লাগল। তারা সংস্কৃতিকে নিয়ে এল রাজসভার মধ্যে এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে। পাল আমলে বাংলা ভাষা ক্রমশ রূপলাভ করছিল। সরহপা পুরবী অপভ্রংশে তাঁর দোঁহাকোষ রচনা করেছিলেন। সেনরা এসে সংস্কৃতকে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবেও সংস্কৃতকে গ্রহণ করেন। তার ফলে এদেশের মানুষের নিজস্ব উচ্চারণের ভাষা সরকারি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা লক্ষ্য করি যে, সেনদের আমলে দেশীয় ভাষার চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। সেনরা যে সংস্কৃতি নিয়ে এল, সে সংস্কৃতি ছিল হিন্দুদের এবং তাও সকল শ্রেণীর হিন্দুদের নয়, তা ছিল কৌলিন্যবাদী ব্রাহ্মণদের এবং অংশত ক্ষত্রিয়দের। সর্বশেষ সেন রাজা লক্ষণ সেনের রাজদরবারে যে সমস্ত কবি-সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরা সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে জয়দেব রাধা-কৃষ্ণ উপাখ্যানকে কাব্যে রূপান্তরিত করে একটি বিশেষ কাব্যধারার জন্ম দিলেন। এর ফলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি পরিপূর্ণভাবে বর্ণহিন্দুদের অধিকারে চলে গেল।

১২০৫ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীর আগমনে এদেশের সাধারণ মানুষ নতুন করে চেতনা পেল। সুকুমার সেন তাঁর একটি রচনায় স্বীকার করেছেন যে, অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা বখতিয়ারের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিল, এমনকি কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণও বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেনকে বিভ্রান্ত করে দেশত্যাগ করতে সহায়তা করেছিল। মানুষে মানুষে বিভাজন মুসলমান আমলে আর রইল না, পাল আমলেও এটা ছিল না। মুসলমানরা একটি নতুন বিশ্বাসকে আনলেন, এদেশের সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন এবং একটি বিস্ময়কর মানবিক চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটালেন।

আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষ এবং বিকাশকে আলোচনা করতে গেলে পাল আমলের বিস্তৃত পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সেনরা যে অসৌজন্যের জন্ম দিয়েছিল, তারও সুস্পষ্ট পরিচিতি উপস্থিত করা প্রয়োজন।

অবশেষে মুসলমান আমলে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি যে নতুন মানবিক রূপ পরিগ্রহ করল তারও বিস্তৃত সমীক্ষার প্রয়োজন। এ নিয়ে অল্পস্বল্প লিখিত হলেও বিস্তৃতভাবে এ নিয়ে কেউ গবেষণা করেননি। সম্প্রতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান এ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং তাঁর 'মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা' গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তাঁর বর্তমান গ্রন্থটি যার নাম 'আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা' আমাদের সংস্কৃতির পরিচয়কে নতুন করে উদ্‌ঘাটন করেছে। আমরা বিশেষ একটি ভূখণ্ডের অধিবাসী এবং সেই ভূখণ্ডের অতীত এবং বিশ্বাস আমাদের সংস্কৃতি নির্মাণে যে বিপুলভাবে সহায়ক, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান তা তাঁর গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। এ অঞ্চলের মানুষের যে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা আছে এবং তা পাল আমল থেকে ক্রমশ গড়ে উঠেছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং সতর্ক বিবেচনা মোহাম্মদ আবদুল মান্নানের গ্রন্থে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঐতিহাসিকের কারণে বহিরাগত সেনদের সংস্কৃতিকে বিরাট এবং মহার্ঘ করে দেখানো হয়েছে এবং আমাদের দেশের অল্পবোধবিমুখ কিছু সংখ্যক লোক হিন্দুদের বিবেচনাটি মেনে নিয়েছে। এহেন অবস্থা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান যে এ পথে এগিয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁকে আমি সাধুবাদ দেই।

তার এই গ্রন্থটি সর্বজনগ্রাহ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

১৪.০২.১৯৯৪

বিষয় বিন্যাস

১.

সভ্যতার পতাকা হাতে সাহসী মানুষ ২১-২৩

২.

বাংলায় আর্য আগমন ২৪-৩২

সাংস্কৃতিক সংঘাত ব পাল আমল : বৌদ্ধ সংস্কৃতির আয়ু বৃদ্ধি ব সেন শাসন : ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একাধিপত্য ব জাতিসত্তা বিনাশের অভিযান ব প্রতিরোধ সংগ্রামে নতুন ধারা

৩.

মুসলিম শাসন : বাংলার ইতিহাসের গঠনমূলক যুগ ৩৩-৩৮

গণেশের রাজনৈতিক 'অভ্যুত্থান' ব শ্রীচৈতন্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব সাঁইত্রিশ বছরের আফগান শাসন ও স্বাধীন বারো ভূঁইয়া ব মোগল কর্তৃত্ব : ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ

৪.

মুসলিম শাসন অবসানের পটভূমি ৩৯-৪৩

এক হাতে বাইবেল অন্য হাতে তরবারি ব মীর কাসিমের শেষ প্রতিরোধ

৫.

পলাশী-উত্তর বাংলার চালচিত্র ৪৪-৭২

ইংরেজ ও তার এ দেশীয় দালালদের লুণ্ঠন ব ব্যবসায়ের নামে 'প্রকাশ্য দস্যুতা' ব ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ব ভূমি-ব্যবস্থা ধ্বংস ও কৃষক-শোষণের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব কোম্পানির সমর্থকরূপে নব্য জমিদার ও মহাজন ব বাংলাদেশের লুটের টাকায় বিলাতে শিল্প-বিপ্লব ব শিক্ষাক্ষেত্রে

মুসলমানদের বিপর্যয় ও হিন্দু-উত্থান ব সরকারি চাকরি : 'মুসলমানদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই' ব ভাষা ও সাহিত্য : মুসলিম সৃষ্টিধারায় বিপর্যয় ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবক্ষয়

৬.

পলাশী-বিপর্যয় ও কলকাতার উত্থান ৭৩-৯৮

মুর্শিদাবাদে লুটপাট : উত্থানের সূচনা ব কলকাতার 'অবাক উত্থান' : ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে অন্ধকার ব কলকাতার বাবু জাগরণ ব উনিশ শতকের কলকাতায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

৭.

বাংলায় জন-বিদ্রোহ ৯৯-১০৯

ফকীর ও কৃষক বিদ্রোহ ব ফরায়েজী ও জিহাদ আন্দোলন ব জিহাদপন্থি তিতুমীরের লড়াই ব ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব আপসহীন বিপ্লবী ধারার অবসান

৮.

বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ ১১০-১১৫

'ভেতর থেকে সংস্কার' ব মুসলিম সাংবাদিকতা ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ব জাতিগত ঐক্য-চেতনার জন্ম

৯.

বঙ্গভঙ্গ : দুই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সংঘাত ১১৬-১৩৮

ঢাকা ও কলকাতা : বিপরীত স্রোতের যাত্রী ব কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের বিরোধিতার ছয় কারণ ব কলকাতার প্রতিক্রিয়া : 'দেড়শ বছরের বৃহত্তম জাতীয় বিপর্যয়' ব স্বদেশী আন্দোলন ব সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ব ঢাকার প্রতিক্রিয়া : ভাগ্যোদয়ের নতুন প্রভাত ব পূর্ববাংলায় উন্নয়নের সুবাতাস ব বঙ্গভঙ্গ রদ : মুসলিম ভারতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

১০.

মুসলিম রাজনীতিতে নবচেতনা ১৩৯-১৪৫

মুসলিম লীগের জন্ম : নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : বিজাতীয় প্রতিক্রিয়া

১১.

হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি : মিল-মিশেলের চেষ্টা ১৪৬-১৪৯

লাখনৌ চুক্তি ব অসহযোগ আন্দোলন ব বেঙ্গল প্যাক্ট ব হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ

১২.

লাহোর প্রস্তাব : জাতীয় ইতিহাসের নতুন মাইলফলক ১৫০-১৫৮

মুসলিম লীগের শক্তির উৎস বাংলাদেশ ব লাহোর প্রস্তাব থেকে দিল্লী প্রস্তাব ব বঙ্গভঙ্গের দাবি তুলল হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস ব মুসলিম লীগ : স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা ব 'কীটদষ্ট ও সঙ্কুচিত' পাকিস্তান ব ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলায় জাগরণের ধারা

১৩.

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ ১৫৯-১৮১

গরমিলের রাজনীতি : স্লোগান বনাম বাস্তবতা ব রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে হঠকারিতা ব জাতীয় সংহতির সংকট ব গরমিলের রাজনীতির : প্রথম দশক ব গরমিলের রাজনীতি : দ্বিতীয় দশক ব ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ব একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

১৪.

বাংলাদেশ : আমাদের মিলিত সংগ্রাম ১৮২-১৯৪

জাতি-স্বাতন্ত্র্য প্রশ্নে সাময়িক বিভ্রান্তি ব ঐক্যের বদলে বিভেদের বীজ ব মূলে সন্দেহ ব জনতার মিলিত সংগ্রাম : মাওলানা ভাসানীর নাম ব জাতিসত্তা ও সংবিধান ব পঁচাত্তরের পটপরিবর্তন ও সিপাহী-জনতার বিপ্লব ব দেশ ছোট কিন্তু জাতি অনেক বড়

[১]

সভ্যতার পতাকা হাতে সাহসী মানুষ

আলেকজান্ডারের সমসাময়িক গ্রীক বিবরণীতে গঙ্গার পুবদিকে গঙ্গারিড়ী বা বঙ্গ-দ্রাবিড়ী নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গা-বিধৌত এ রাজ্যের বঙ্গ-দ্রাবিড় জাতি ছিল অপরাজেয় শক্তি। টলেমী জানাচ্ছেন, গঙ্গা-মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গঙ্গারিড়ীরা বাস করে। তাদের রাজধানী গঙ্গা খ্যাতিসম্পন্ন এক আন্তর্জাতিক বন্দর। এখানকার তৈরি সূক্ষ্ম মসলিন ও প্রবাল-রত্ন পশ্চিম দেশে রপ্তানি হয়। তাদের মতো পরাক্রান্ত জাতি ভারতে আর নেই।

আদিতে বঙ্গ ছিল বর্তমান বাংলাদেশেরই একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। পাল ও সেন রাজাদের আমলেও বঙ্গ সেই স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রতর রূপেই পরিচিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের শুরুর দিকেও বাংলার শুধু পুর্ব-দক্ষিণ অঞ্চলই বঙ্গ নামে অভিহিত হতো। পাল ও সেন আমলে এবং মুসলিম শাসনের গোড়ার দিকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ পরিচিত ছিল রাঢ় নামে। উত্তর বঙ্গকে বলা হতো পুন্ড্রবর্ধন, বরিন্দ কিংবা লাখনৌতি। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কিছু অংশ গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। বাংলার পুব ও দক্ষিণ অঞ্চলকে মিনহাজউদ্দীন সিরাজ তাঁর ১২৪২-৪৪ সালের তাবাকাত-ই-নাসিরীতে বঙ্গ নামে উল্লেখ করেছেন। এই এলাকা গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমলে মুসলমানদের কাছে বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। চৌদ্দ শতকের শেষভাগে জিয়াউদ্দীন বারনী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তারিখ-ই-ফীরূজশাহীতে প্রথম তা উল্লেখ করেন। মিনহাজের 'বঙ্গ' আর বারনীর 'বাঙ্গালাহ' বাংলার পুব-দক্ষিণবর্তী অভিন্ন অঞ্চল। বৃহত্তর ঢাকা ও সাবেক ত্রিপুরা জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চল সমতট নামেও পরিচিত হয়েছে। এ থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশের বাইরের কোন এলাকা দূর-অতীতে কখনো বাংলা বা বাঙ্গালা কিংবা বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল না।

বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতান হাজী শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ (শাসন ১৩৩৯-৫৮ ঈসায়ী) প্রথমবারের মতো গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিু অববাহিকার ব্যাপকতর এলাকাকে বাঙ্গালাহ নামে অভিহিত করেন। লাখনৌতি (বর্তমান উত্তরবঙ্গ) ও বাঙ্গালাহকে তিনিই স্বাধীন সুলতানী শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল তার আমলেই প্রথম বাঙ্গালাহ নামে পরিচিত হয় এবং তিনি প্রথমবারের মতো শাহ-ই-বাঙ্গালাহ নাম ধারণ করে নিজেকে বৃহৎ বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করেন। এর ফলে এখানে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্যের সূচনা হয়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতার ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও (কম) আদরের– সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান (মুসলিম) আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" (বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব– সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা ২২)

এরপর বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার আয়তন পরিবর্তিত হয়েছে। শুধু বৃটিশ ভারতের বৃহৎ বঙ্গ প্রদেশ নয়, পশ্চিমে বিহারের অংশ, পুবে আসাম এবং কোন কোন সময় উড়িষ্যার অংশবিশেষও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এসবের শাখানদীর প্রবাহ, বৃষ্টিপাত, মাটির পাললিক গঠন ও মৌসুমী আবহাওয়া বাংলাদেশের মাটিকে বিস্ময়করভাবে উর্বর করেছে, চাষাবাদকে করেছে উৎসাহিত। সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপনের আকর্ষণ আর ভূ-প্রকৃতিগত কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুততার ফলে বাংলাদেশ হয়েছে ঘন বসতিপূর্ণ। নদ-নদীর তীর ঘেঁষে এখানে গড়ে উঠেছে মানব-বসতি, পত্তন হয়েছে গ্রাম-বন্দর। এ জনপদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট-বাজার-বন্দর বিকশিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহকে ঘিরে। নদ-নদীর দুই পার জুড়ে যুগ যুগ ধরে চলেছে বিরামহীন ভাঙ্গা-গড়া আর পরিবর্তনের ধারা। এদেশের অনেক জনাকীর্ণ শহর-গ্রাম-জনপদের উত্থান আর পতনের সাথে এ ধারা মিশে আছে। বাংলার জন-জীবনে এবং এদেশের রাজনৈতিক গতিপথ নিয়ন্ত্রণেও যুগ-যুগ ধরে নদ-নদীর রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা।

নদ-নদীর প্রবাহ এ দেশের সমতলভূমিকে অসংখ্য খণ্ডে বিভাজিত করেছে। এসব ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডকে অভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর আওতায় ঐক্যবদ্ধ করা ও ঐক্যবদ্ধ রাখা বরাবরই ছিল কঠিন কাজ। এসব বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত এলাকায় স্বাতন্ত্র্যকামী রাজনৈতিক সত্তার উত্থান ও বিকাশ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসকের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে এ এলাকার রাজনীতি চিহ্নিত হয়েছে বহুকাল। রাজ্য ও প্রশাসনিক অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত হয়েছে নদ-নদীর প্রবাহের দ্বারা। বহিঃসীমান্তের নদীপ্রবাহ এবং অভ্যন্তর ভাগের অসংখ্য শাখা, প্রবাহ, বিস্তীর্ণ জলাভূমি, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা ও জলপ্লাবিত সমতলভূমি এদেশকে দুর্গম করেছে। বাইরের হামলার বিরুদ্ধে দিয়েছে প্রতিরক্ষার প্রাকৃতিক সুবিধা। এ বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আদি-বঙ্গ বরাবরই বাইরের হামলা থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। অন্যদিকে রাঢ় অঞ্চল ও উত্তর বঙ্গ প্রাচীনকালে বহুবার উত্তর ভারতীয় শাসকদের কর্তৃত্বাধীন হয়েছে।

নদী-মাতৃক বাংলাদেশের বিশেষ ভূ-প্রকৃতি এ দেশের মানুষের চরিত্র ও জীবন-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশ এ এলাকার মানুষকে কষ্ট-সহিষ্ণু, সাহসী ও সংগ্রামী করেছে। সংগ্রামশীল এই সাহসী মানুষেরা বেড়ে উঠেছে স্বাধীনতার দুর্জয় প্রেরণা নিয়ে। হাজার বছরের কুসংস্কার আর অধর্মের বিকৃতি বুকে নিয়ে বৈদিক শাস্ত্র-শাসনের ভারে ন্যুব্জ ও আড়ষ্ট ভারত তার ধর্মে, রাষ্ট্রে বা সমাজে যে কোন পরিবর্তনের ধারাকে ভয় পায়, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের প্রাণ-ধর্ম ও হৃদয়-আবেগের দু'ধার স্রোতস্বিনীর মুখে সেসব জঞ্জাল ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অনায়াসে।

সেমিটিক তৌহিদবাদী ধর্মমতের উত্তর-পুরুষ এবং উন্নততর সংস্কৃতির ধারক বঙ্গ-দ্রাবিড়রা আর্যদের শির্কবাদী ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্থ, তাদের তপস্যা ও যাগযজ্ঞ এবং তাদের ব্রাহ্মণদের পবিত্র ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে কখনো কবুল করেনি, মেনে নেয়নি। রাজশক্তির প্রচণ্ড দাপট, নযিরবিহীন জুলুম-সন্ত্রাস চালিয়েও এ এলাকার সাধারণ মানুষকে বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির বশীভূত করা যায়নি। অথচ বিশ্বাস, শিক্ষা, সৎকর্মশীলতা ও অহিংসার বাণীবাহী জৈন ধর্ম এ এলাকায় প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথেই এখানকার মানুষের চিত্ত জুড়ে গভীর আসন গেড়েছে। জীবের নির্বাণ লাভের বুদ্ধ-বাণী তাদেরকে উন্নত জীবনবোধে সঞ্জীবিত করেছে। জৈন ও বৌদ্ধ প্রচারকদের আহ্বানে এখানকার মানুষ

স্বতস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। সবশেষে মানব-মুক্তির মহাসনদ ইসলাম চিহ্নিত হয়েছে এ জনগোষ্ঠীর চূড়ান্ত মঞ্জিলরূপে।

সিন্ধু নদের উপত্যকায় ও তার সংলগ্ন এলাকায় এবং মধ্য-ভারতে ও রাজস্থানের নানা জায়গায় প্রাক-আর্য তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন বাংলা ও তার সংলগ্ন এলাকায় এমনি সভ্যতা-সম্পন্ন এক মানবগোষ্ঠী বাস করত। তারা প্রধানত দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা ছিল। এ উপমহাদেশে দ্রাবিড়দের আগমন ঘটেছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে। তারা এসেছে সেমিটিকদের আদি বাসভূমি পশ্চিম এশিয়া থেকে। ব্যাবিলন বা মেসোপটেমিয়া দ্রাবিড়দের উৎপত্তিস্থল। এই সেমিটিকরাই পৃথিবীতে প্রথম সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে। তারাই ইয়েমেন ও ব্যাবিলনকে সভ্যতার আদি বিকাশভূমিরূপে নির্মাণ করেছে। পৃথিবীতে প্রথম লিপি বা বর্ণমালা উদ্ভাবন দ্রাবিড় জাতিরই অবদান। সুপ্রাচীন এক গর্বিত সভ্যতার পতাকাবাহী এই দ্রাবিড় জাতির লোকেরা ভাতরবর্ষে আর্য আগমনের হাজার হাজার বছর আগে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতা নির্মাণ করেছিল। অনুরূপ সভ্যতার পত্তন হয়তো তারা বাংলাদেশেও করেছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে সেগুলোর চিহ্ন এখন নেই। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন :

'তারা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মতো সুন্দর নগরী পাক-বাংলায় নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ উপকরণের পার্থক্যহেতু স্থপতিতেও নিশ্চয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবের কোন চিহ্ন নাই। প্রাকৃতিক কারণে পাক-বাংলায় চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ-অট্টালিকা নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলা যেমন দুষ্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতি, মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া পাক-বাংলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দায করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না।' (আমাদের কৃষ্টিক পটভূমি, পূর্বদেশ, ঈদ সংখ্যা-১৯৬৯)।

[২]

বাংলায় আর্য আগমন

দ্রাবিড় অধ্যুষিত সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর ভারত আর্যদের দখলে চলে যাওয়ার পর এই যাযাবরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে অধিকাংশ দ্রাবিড় দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। আর্যরা তাদের দখল বাড়াতে বাড়াতে আরো পুবদিকে অগ্রসর হয়। সামরিক বিজয়ের সাথে সাথে বৈদিক আর্যরা তাদের ধর্ম-সংস্কৃতির বিজয় অর্জনেও সকল শক্তি নিয়োগ করে। প্রায় সম্পূর্ণ উত্তর ভারত আর্যদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু স্বাধীন মনোভাব ও নিজ কৃষ্টির গর্বে গর্বিত বঙ্গবাসীরা আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ায়। ফলে করতোয়ার তীর পর্যন্ত এসে আর্যদের সামরিক অভিযান থমকে দাঁড়ায়।

আমাদের সংগ্রামী পূর্বপুরুষদের এই প্রতিরোধ-যুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু লিখেন :

> "প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত যখন বিজয়ী আর্য জাতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, বঙ্গবাসীরা তখন সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, আর্যদের হোমাগ্নি সরস্বতী তীর হইতে ভাগলপুরের সদানীরা (করতোয়া) নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সদানীরার অপর পারে অবস্থিত বঙ্গদেশের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ২১)

সামরিক অভিযান ব্যাহত হওয়ার পর আর্যরা অগ্রসর হয় ঘোর পথে। তারা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিযান পরিচালনা করে। তাই দেখা যায়, আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এ দেশে প্রথম আসেনি, আগে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। কেননা, ধর্ম-

কৃষ্টি-সংস্কৃতি-সভ্যতার বিজয় সম্পন্ন হয়ে গেলে সামরিক বিজয় সহজেই হয়ে যাবে। এ এলাকার জনগণ ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, তা ছিল মূলত তাদের ধর্ম-কৃষ্টি-সভ্যতা হেফাযত করার লড়াই। তাদের এই প্রতিরোধ সংগ্রাম শত শত বছর স্থায়ী হয়। 'স্বর্গ রাজ্যে' প্রাধ্যন্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের যে অসংখ্য কাহিনী ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি আর্য সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে, সেগুলো আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামেরই কাহিনী। আমাদের পূর্ব পুরুষদের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামের কাহিনীকে এসব আর্য সাহিত্যে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ধর্মশাস্ত্রে কোন মানবগোষ্ঠীকে এমন নোংরা ভাষায় চিহ্নিত করার নযীর পাওয়া যাবে না। উইলিয়াম হান্টার তার 'এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' বইয়ে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "সংস্কৃত সাহিত্যে বিবৃত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা হলো আদিম অধিবাসীদের সাথে আর্যদের বিরোধ। এই বিরোধজনিত আবেগ সমানভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ঋষিদের স্তবগানে, ধর্মগুরুদের অনুশাসনে এবং মহাকবিদের কিংবদন্তীতে।... যুগ যুগ ধরে সংস্কৃত প্রবক্তারা আদিবাসীদেরকে প্রতিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদের থেকে ঘৃণাভরে দূরে থেকেছে।"

সাংস্কৃতিক সংঘাত

কামরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'এ সোশ্যাল হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' বইয়ে দেখিয়েছেন : তিন স্তরে বিভক্ত আর্য সমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা প্রথমে বাংলায় আসেনি। এদেশে প্রথমে এসেছে ব্রাহ্মণেরা। তারা এসেছে বেদান্ত দর্শন প্রচারের নামে। বাংলা ও বিহারের জনগণ আর্য-অধিকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তাও ছিল ধর্মভিত্তিক তথা সাংস্কৃতিক।

আর্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ধর্ম তথা সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে জেগে ওঠা এই এলাকার সেমিটিক ঐতিহ্যের অধিকারী জনগণের সংক্ষোভের তোড়ে উত্তরাপথের পূর্বপ্রান্তবর্তী প্রদেশগুলোর আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল।

বঙ্গ-দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব চার শতক পর্যন্ত এদেশে আর্য-প্রভাব রুখে দেওয়া সম্ভব হয়। খ্রিস্টপূর্ব চার শতকে মৌর্য এবং তার পর গুপ্ত রাজবংশ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় আর্য ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়নি। মৌর্যদের বিজয়কাল থেকেই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বাড়তে থাকে। তারপর চার ও পাঁচ খ্রিস্টাব্দের গুপ্ত শাসনামলে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে।

মৌর্য বংশের শাসনকাল পর্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। অশোকের যুগ পর্যন্ত এই ধর্মে মূর্তির প্রচলন ছিল না। কিন্তু তারপর তথাকথিত সমন্বয়ের নামে বৌদ্ধ ধর্মে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু তান্ত্রিকতার প্রবেশ ঘটে। হিন্দু দেব-দেবীরা বৌদ্ধ মূর্তির রূপ ধারণ করে বৌদ্ধদের পূজা লাভ করতে শুরু করে। বৌদ্ধ ধর্মের এই বিকৃতি সম্পর্কে মাইকেল এডওয়ার্ডস 'এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া' বইয়ে লিখেছেন :

"Buddhism had, for a variety of reasons, declined and many of its ideas and forms had been absorbed into Hinduism. The Hinduization of the simple teachings of Gautama was reflected in the elevation of the Buddha into a Divine being surrounded, in sculptural representations, by the gods of the Hindu partheon. The Buddha later came to be shown as an incarnation of Vishnu."

সতিশচন্দ্র মিত্র তাঁর 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন :

"যোগীরা এখন হিন্দুর মত শবদেহ পোড়াইয়া থাকেন, পূর্বে ইহা পুঁতিয়া রাখিতেন। .... উপবিষ্ট অবস্থায় পুঁতিয়া রাখা হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগিত, তাঁহারা মনে করিতেন, উহাতে যেন শবদেহ কষ্ট পায়।"

অর্থাৎ হিন্দুদের চোখে বিসদৃশ লাগার কারণে এভাবে বৌদ্ধদেরকে পর্যায়ক্রমে তাদের ধর্ম-সংস্কৃতি তথা জীবনাচরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই মুছে ফেলতে হয়েছিল। অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের প্রতিমা-পূজা চালু ছিল না। পরে বুদ্ধের শূন্য আসনে শোভা পেল নিলোফার বা পদ্ম ফুল। তারপর বুদ্ধের চরণ দেখা গেল। শেষে বুদ্ধের গোটা দেহটাই পূজার মণ্ডপে জেঁকে বসল। এভাবে

ধীরে ধীরে এমন সময় আসল, যখন বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্ম থেকে আলাদা করে দেখার সুযোগ লোপ পেতে থাকল।

গুপ্ত আমলে বাংলাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দোর্দন্ড প্রতাপ শুরু হয়। আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির স্রোত প্রবল বেগে আছড়ে পড়ে এখানে। এর মোকাবিলায় জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত হয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে আশ্রয় করে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বাংলা ও বিহারের জনগণের আত্মরক্ষার সংগ্রামে এ সময় প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর জনগণের আর্য-আগ্রাসনবিরোধী প্রতিরোধ শক্তিকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি দীর্ঘদিন এ এলাকার প্রধান ধর্ম ও সংস্কৃতিরূপে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিকও স্বীকার করেছেন :

"আর্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য ধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম এই আন্দোলনের ফলাফল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৭-২৮)

এ আন্দোলনের তোড়ে বাংলা ও বিহারে আর্য রাজত্ব ভেসে গিয়েছিল। আর্য-দখল থেকে এ সময় উত্তরাপথের পুব-সীমানার রাজ্যগুলো শুধু মুক্তই হয়নি, শতদ্রু নদী পর্যন্ত সমস্ত এলাকা অনার্য রাজাদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ও সংস্কৃতির অনাচারের বিরুদ্ধে সমুত্থিত জনজাগরণের শক্তিতেই শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের শূদ্র-পুত্র মহাপদ্মনন্দ ভারত-ভূমিকে নিঃক্ষত্রিয় করার শপথ নিয়েছিলেন এবং ক্ষত্রিয় রাজকুল নির্মূল করে সমগ্র আর্যাবর্ত অনার্য অধিকারে এনে 'একরাট' উপাধি ধারণ করেছিলেন।

বাংলাদেশেই আর্যবিরোধী সংগ্রাম সবচে প্রবল হয়েছিল। এর কারণ হিসেবে আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন :

"সেমিটিক ধর্ম অনুসারীদের উত্তর পুরুষ হিসেবে এ এলাকার মানুষের তৌহিদবাদ ও আসমানী কিতাব সম্পর্কে ধারণা থাকাই স্বাভাবিক এবং সম্ভবত তাদের একটি অংশ আর্য আগমনকালে তৌহীবাদের সাথে জড়িত ছিল। এ কারণেই শের্কবাদী ও পৌত্তলিক আর্যদের সাথে তাদের বিরোধ চলতে থাকে।" (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৪)

জৈন ধর্মের প্রচারক মহাবীর আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতমের জীবনধারা এবং তাদের সত্য-সন্ধানের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে মওলানা আবুল কালাম আযাদসহ অনেক গবেষক মনে করেন যে, তারা হয়তো বিশুদ্ধ সত্য ধর্মই প্রচার করেছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্র ও বিকৃতি তাদের সে সত্য ধর্মকে পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যে, তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান তালিব লিখেছেন :

"জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে এ ষড়যন্ত্রের বহু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এ উভয় ধর্মই আর্যদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদকে ঐশী গ্রন্থ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তপস্যা, যাগযজ্ঞ ও পশুবলিকে অর্থহীন গণ্য করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্রতা ও নরশ্রেষ্ঠ হওয়ার ধারণাকে সমাজ থেকে নির্মূল করে দেয়। ফলে বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি নড়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবে জনসাধারণ এ ধর্মদ্বয়ের আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দেয়। দ্রাবিড় ও অন্যান্য অনার্য ছাড়া বিপুল সংখ্যক আর্যও এ ধর্ম গ্রহণ করে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মদ্বয়কে প্রথমে নাস্তিক্যবাদের অন্তর্ভুক্ত করে। নাস্তিক্যবাদের সংজ্ঞা তারা এভাবেই নিরূপণ করে যে, বেদবিরোধী মাত্রই নাস্তিক। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধরাও নাস্তিক। অতঃপর উভয় ধর্মীয়দের নিরীশ্বরবাদী প্রবণতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলে।" (বাংলাদেশে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)

মওলানা আবুল কালাম আযাদ দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধ কখনো নিজেকে ভগবান দাবি করেননি। অশোকের যুগ পর্যন্ত বুদ্ধ-মূর্তির প্রচলনও কোথাও ছিল না। প্রতিমা পূজাকে সত্যের পথে এক বিরাট বাধা গণ্য করে সেই অজস্র খোদার খপ্পর থেকে বুদ্ধ মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মণ্য খোদাকে অস্বীকার করে দিব্যজ্ঞানলাভ ও সত্য-সাধনায় মুক্তি নিহিত বলে ঘোষণা করেছিলেন।

বাংলায় দ্রাবিড়দের প্রতিরোধের ফলে দীর্ঘ দিন আর্য-প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এরপর খ্রিস্টীয় চার ও পাঁচ শতকে গুপ্ত শাসনে আর্য ধর্ম, আর্য ভাষা ও আর্য সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষভাবে শিকড় গাড়ে। তৃতীয় ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্য বৈদিক হিন্দু ধর্মের কিছুই প্রসার হয়নি। ষষ্ঠ শতকের আগে বঙ্গ বা বাংলার পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঢুকতেই পারেনি। উত্তর-

পূর্ববাংলায় ষষ্ঠ শতকের গোড়াতেই ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে ওঠে। পঞ্চম ও অষ্টম শতকের মধ্যে ব্যক্তি ও জায়গার সংস্কৃত নাম পাওয়া যায়। তা থেকে ড. নীহাররঞ্জন রায় অনুমান করেন যে, তখন বাংলার আর্যীকরণ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। বাঙালি সমাজ উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল। অযোধ্যাবাসী ভিন প্রদেশী ব্রাহ্মণ, শর্মা বা স্বামী, বন্দ্য, চট্ট, ভট্ট, গাঙি নামে ব্রাহ্মণেরা জেঁকে বসেছিল :

"বাংলাদেশের নানা জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এসে স্থায়ী বাসিন্দা হতে লাগলেন, এরা কেউ ঋগ্বেদীয়, কেউ বাজসনেয়ী, কেউ শাখাব্যায়ী, যাজুর্বেদীয়, কেউ বা সামবেদীয়, কারও গোত্র কান্ব বা ভার্গব, বা কাশ্বপ, কারও ভরদ্বাজ বা অগস্ত্য বা বাৎস্য বা কৌন্ডিন্য। এমনি করে ষষ্ঠ শতকে আর্যদের বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্বতম প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল।" (ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃষ্ঠা ১৩২)

সাত শতকের একেবারে শুরুতে গুপ্ত রাজাদের মহাসামন্ত ব্রাহ্মণ্য-শৈবধর্মের অনুসারী শশাংক রাঢ়ের রাজা হয়ে পুন্ড্রবর্ধন অধিকার করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করে তিনি বৌদ্ধ নির্মূলের নিষ্ঠুর অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা শশাংক গয়ায় বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন। তিনি আদেশ জারি করেন :

"সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত যেখানে যত বৌদ্ধ আছে, তাহাদের বৃদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত যে না হত্যা করিবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।" (রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, পৃষ্ঠা ১২৪)

সাত শতকের শেষার্ধ থেকে আট শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ঘোর বিশৃঙ্খলাপূর্ণ 'মাৎসান্যায় যুগ'। এ যুগে জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামের শিথিলতার সুযোগে আর্য-ব্রাহ্মণেরা তাদের তৎপরতা আরো জোরদার করে। এ সময় বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। মাৎস্যন্যায়ের এ অন্ধকার যুগেই এদেশে সংস্কৃত ভাষাও মাথা তোলে।

পাল আমল : বৌদ্ধ সংস্কৃতির আয়ু বৃদ্ধি

দীর্ঘ এক শতাব্দীর মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটিয়ে আট শতকের মধ্যভাগে গরিষ্ঠ জনমতের প্রতিফলনের ভিত্তিতে গৌড়-বঙ্গ-বিহারে বৌদ্ধ মতাবলম্বী পাল

শাসনের সূচনা হয়। পাল শাসনের চারশ' বছর ছিল এদেশের মানুষের গৌরব পুনরুদ্ধার, আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এ আমলে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র। কয়েকটি ছাড়া সকল মহাবিহার ছিল বাংলাদেশে। দশ শতকের শেষভাগের জ্যেষ্ঠজেতাবীর বাড়ি ছিল উত্তর বঙ্গে। তার ছাত্র বিক্রমপুরের অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান (৯৮০-১০৩৫) জ্ঞানরাজ্যের এক বিশ্ববিশ্রুত নাম। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্রও ছিলেন বাংলাদেশের অধিবাসী। তিনি ছিলেন হিউয়েন সাঙ-এর শিক্ষক। জনগণের মুখের ভাষার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এ যুগের আরেক গৌরব। এ যুগ ছিল বাংলা ভাষার সৃজ্যমান কাল।

বাংলার পাল-রাজত্ব চারশ' বছর স্থায়ী হয়। গৌড়-বঙ্গে পাল শাসন চলাকালে ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সমসাময়িক আর্য-ব্রাহ্মণ্য শক্তিপুঞ্জ সুলতান মাহমুদের হামলায় বিব্রত ও বিপর্যস্ত ছিল। ফলে পাল শাসন তার ভৌগোলিক সীমান্তে দীর্ঘদিন নিরুপদ্রব থাকে। আট শতক থেকে এগারো শতক পর্যন্ত পাল শাসনে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। বাংলা ও বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম এ সময় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা অর্জন করে। পূর্ব ভারত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পরমায়ু আরো চার-পাঁচশ' বছর বৃদ্ধি পায়।

পাল আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির সাথে বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির মিল-সমন্বয়ের স্লোগান দেয়। বহিঃসীমান্তে তাদের মিত্ররা সাময়িকভাবে সুবিধা করতে না পারলেও ব্রাহ্মণদের এই চতুর কৌশল বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল। ড. নীহাররঞ্জন রায় তারই বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেন :

"পাল রাজাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ রাজ-পরিবারের মেয়ে বিয়ে করছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।" (বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৩৯)

এ সময় পাল রাজারা অনেকেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য মূর্তি আর তাদের মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। তাদের চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াকর্মে নিজ সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য মুছে গিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। বিশেষত দশ শতক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে পূজাচারের প্রভাব দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়

হলো, পাল-পূর্ব যুগের বৌদ্ধ মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় না। যা কিছু পাওয়া যায় নয় শতক থেকে এগারো শতকের মধ্যেকার। এই সমন্বয় ছিল এক তরফা। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচেই গড়ে উঠেছিল সবকিছু। নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায় :

"এই মিল-সমন্বয় সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম তার দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল।... বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাহ্য ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় লোকের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকর্ষণ কমে এসেছিল।" (বাঙালির ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৫১)

তথাকথিত এই মিল-সমন্বয়ের আদর্শ বাংলাদেশের জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের খোল-নলচে পাল্টে দিচ্ছিল, তাদের জাতিসত্তাকে করে তুলেছিল অন্তঃসারশূন্য, আর রাষ্ট্রসত্তাকে করে তুলেছিল বিপন্ন। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সীমানা হেফাযত করতে না পারলে সে জাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ পাল শাসকেরা রেখে গেছেন।